বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা কমিশন গঠনের আবশ্যকতা

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী
০৫ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করি। আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ জীবন দান করেন এবং সম্ভ্রম হারান ২ লাখ মা ও বোন। পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা এক অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। মানব ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষ পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে। তবে গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ করি যে, স্বাধীনতার মূল যে চেতনা তা কোনোভাবেই প্রতিফলিত হয়নি স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের কার্যক্রমের মধ্যে। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ ও স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করেছিল, তাদের সেই স্বপ্ন স্বাধীনতার পর পরই হারিয়ে যায়। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর স্বল্পকালের জন্য হলেও একটা আশার আলো দেখা গিয়েছিল কিন্তু অচিরেই সে আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায় এরশাদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক ধারার একটি সূচনা ঘটলেও তা বেশিদিন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি।

UNIBOTS

এভাবে পর্যায়ক্রমে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যতটুকু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল তা ২০০৯ সালের পর থেকে ক্রমেই হারিয়ে যেতে থাকে। গত ১৫ বছরে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার দেশের গণতান্ত্রিক ধারার সব ধরনের অবলম্বন, প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ফেলে। কেবল তাই নয়, তারা কোনোভাবেই গণতন্ত্রের ন্যূনতম চর্চাকে কোনোক্রমেই স্থান দেয়নি বাংলাদেশের কোনো পর্যায়ে।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার কেবল গণতন্ত্রকেই সমূলে বিনাশ করেনি, তারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, উন্নয়নের ধারাসহ বাদবাকি জাতীয় অগ্রগতির কোনো কিছুকেই স্বাভাবিক বিকাশের পথে থাকতে দেয়নি। একদিকে নির্বিচার রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠন, অপরদিকে গণতন্ত্রের হত্যাÑ সব মিলিয়ে এক বিভীষিকাময় রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের এক বিরামহীন এবং অতুলনীয় আয়োজন করে আওয়ামী লীগ এবং এর একদল সমর্থক গোষ্ঠী। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। জনগণ এক বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদের এ নির্মম ও তুলনাহীন অপশাসনের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার এক মহান গণ-অভ্যুত্থান সূচিত হয়। এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পতন ঘটে পনেরো বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের। জনগণের দীর্ঘদিনের আশা-আকাক্সক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে ’২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান। ছাত্র-জনতার এই ঐতিহাসিক গণসংগ্রামে ছাত্র-জনতার পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত; যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারা বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করেছেন জাতীয় ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করার জন্য। রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ; যথাÑ অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য কমিশন গঠন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, নয়-দশটি কমিশন গঠিত হলেও শিক্ষা কমিশনরূপে কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে শিক্ষার সংস্কার একটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য। কেননা শিক্ষাই হচ্ছে একটি জাতির মেরুদণ্ড এবং বাংলাদেশে শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কোনোভাবেই অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা যায় না। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করলাম, বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করা হলেও শিক্ষা কমিশন নামে কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি। শিক্ষাই একটি জাতির সামগ্রিক উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে আর বাংলাদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কলুষিত হয়েছে। শিক্ষাকে দলীয়করণ করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার

সর্বপ্রকার কাঠামোগত, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে। '২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের একটি মূল চেতনা এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জাতিকে একটি আদর্শগত শিক্ষার পরিবেশে পুনরায় ফিরিয়ে আনা। এই প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন হচ্ছে শুধু সময়ের দাবি নয়, এটি জাতীয় প্রয়োজন; যার কোনো বিকল্প হতে পারে না।

আমরা সবাই জানি যে, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত দেড় দশকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠার বদলে দলীয় রাজনীতির আড্ডাখানা হিসেবে গড়ে উঠেছে। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে শুধু দলীয় আনুগত্য এবং দলবাজি করার কারণে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে শিক্ষার সব স্তরে। এমনকি বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রেও আওয়ামী দলবাজির নিকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। এর অনিবার্য ফল দাঁড়িয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে এক অসহনীয় সর্বনাশা অবনতি। এই অবনতি এমন স্তরে নেমে গেছে যে, বাংলাদেশে আদৌ কোনো সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা আছে কি না, তা এক গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার রাষ্ট্রের এমন কোনো উপাদান নেই যেখানে বিনষ্টের শেষটুকু বাকি রেখেছে। কেবল শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও প্রকরণ নষ্ট করেই ফ্যাসিবাদ ক্ষান্ত হয়নি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও দলবাজির নিকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ¯ুলে-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডিতে আওয়ামী দলবাজির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে; এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও নগ্ন দলীয়করণের উদাহরণ দেখা যায়। বর্ণিত পরিস্থিতিতে আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করি যে, দেশে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অনেক শিক্ষার্থী অর্ধশিক্ষিত রয়ে গেছে। তাদের শিক্ষার মান এতই হতাশাব্যঞ্জক ও নিম্নগামী যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র বাদ দিলেও দেশীয় প্রেক্ষাপটেও তা অত্যন্ত হতাশাজনক।

আধুনিক বিশ্বে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। উচ্চশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞানের জগতে বহু নতুন জ্ঞানের সংযোজন হয়েছে; সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডার। উন্নত দেশে বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসারের কারণে জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটেছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও এর ঢেউ লেগেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ, উঁচুমান এবং অধুনা সৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না। এ যুগ বিশ্বায়নের যুগ। সমগ্র বিশ্বকে একটি বৃহৎ পল্লীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অতএব এ বৃহৎ পল্লীর এক অঞ্চলের উন্নয়নের প্রভাব অন্য অঞ্চলে পড়তে বাধ্য। তা ছাড়া জ্ঞানের জগতে কোনো সীমারেখা নেই। জ্ঞান প্রবহমান; এক থেকে বহুর মধ্যে সঞ্চারিত হয় যদি না কেউ জ্ঞানবিমুখ হয়। আমাদের দেশে সীমিত আকারে উচ্চশিক্ষার প্রচলন বহুকাল আগেই শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়, তার পর থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পৃথিবীর এ অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। তদানীন্তন পূর্ববাংলায় হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি কলেজ ছিল, যেখানে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হতো। এই সীমিত সুযোগ গ্রহণ করেছিল এই অঞ্চলের এক উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানরা ছিল পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর। এর কারণ ছিল ঐতিহাসিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা এবং উচ্চশিক্ষার অত্যন্ত সীমিত সুযোগ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গের কারণে এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে নতুন আশা-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে প্রভাবশালী হিন্দুদের বাধার মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। এতে এ অঞ্চলের মুসলিম নেতাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ হলো উচ্চশিক্ষার অভাব। তাই উচ্চশিক্ষার প্রসারকল্পে তারা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। স্যার নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, এ.

কে. ফজলুল হক প্রমুখ নেতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। এই পটভূমিতে ১৯২১ সালে ঢাকা শহরের রমনার মনোরম পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই বছরের জুলাই মাস থেকে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে এ দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

এরই মধ্যে দেশে আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষার মান ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার এই মান আমরা ধরে রাখতে পারিনি; পারেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পর ইংরেজিসহ বাংলা ভাষাকেও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এ কথা সত্য যে, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করা ছিল তখনকার সময়ের দাবি। তাই এ ধরনের জাতীয় সিদ্ধান্ত তখন গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এর একটি নেতিবাচক প্রভাবও জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছিল। স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে শিক্ষার মান ক্রমেই অবনতিশীল হয়। নানা কারণে পাঁচ দশক যাবৎ এ দেশের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিম্নমুখী। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সব স্তরে শিক্ষার মানের অবনতি হয়েছে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই উচ্চশিক্ষার স্তরেও। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার সব স্তর একই সূত্রে গাঁথা। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে, '৬০-এর দশক পর্যন্ত আমরা এ দেশে উচ্চশিক্ষার যে মান অর্জন করেছিলাম, স্বাধীনতা-উত্তরকালে সে মানের শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছি। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার অবহেলার কারণে এই সময়ে আমরা আমাদের উচ্চশিক্ষার নিদারুণ নিম্নমান ডেকে এনেছি।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক আমি শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য এবং আদর্শগত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখে একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের প্রস্তাব করছি। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, এ দেশের একজন প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে আমি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল যে, একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করা এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ। আমি প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উল্লেখ করছি।

কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে সংঘটিত সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির তদন্ত করবে।

প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে অনিয়ম, দলীয়করণ এবং সীমাহীন দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি ঘটেছেÑ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করবে।

শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্তহীন আর্থিক অনিয়মের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে অর্থ আত্মসাৎ, পুকুরচুরি, প্রকল্পের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ চুরি ইত্যাদির তদন্ত করতে হবে।

কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদানে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

আমি মনে করি তরুণ শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান গ্রহণ করবে না।

কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি তদন্তপূর্বক জাতির সামনে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে। ইতোমধ্যে আর্থিক খাতের অনিয়ম ইত্যাদি নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই যে, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা মারাত্মকভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। কেবল দলীয় স্বার্থে অধ্যাদেশকে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি কোনো একজন উপাচার্য সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে আসীন থেকেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, '৭৩-এর অধ্যাদেশের কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন; সময়ের প্রয়োজনেই তা প্রয়োজন। এটিকে যুগোপযোগী করে তোলা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার নৈতিক কর্তব্য। এ প্রক্রিয়ায় অবশ্যই শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আমাদের জ্ঞানজগতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য আমি মনে করি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়ও কয়েকটি গুণগত পরিবর্তন ও সংযোজন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমি নিম্নবর্ণিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।

১. প্রথমত, উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে আমাদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই ইরেজি শিক্ষা চালু করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তৃতীয় শ্রেণি থেকে একজন ছাত্রছাত্রী বিদেশি ভাষা শিখতে (গ্রহণ করতে) পারে। তাই আমি মনে করি, প্রাথমিক শিক্ষার এই পর্যায় থেকে ইংরেজি শিক্ষা প্রদান শুরু করলে এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভাষার পঠন-পাঠন ও চর্চা অব্যাহত রাখলে (বৃদ্ধি পেলে) ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি ভাষা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। অতএব কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক ও সহায়কগ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণ সহজতর হবে। পাশাপাশি আমাদের ইংরেজি পাঠ্যবই ও সহায়ক গ্রন্থের অনুবাদ এবং বাংলা ভাষায় বই রচনার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

২. দ্বিতীয়ত, উচ্চ শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে। ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার আছে কিন্তু শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসী রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, জাতীয় বা ছাত্ররাজনীতি কোনোভাবেই শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করবে না। ছাত্ররা এমন কোনো সহিংস এবং হীন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে না যা শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট ও কলুষিত করে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, তারা হীন রাজনৈতিক স্বার্থে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার করবে না। যখন-তখন রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে অচল করে দেবে না। তা হলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসমুক্ত হবে।

৩. তৃতীয়ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারলে সেশনজট দূরীভূত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে তথা জাতীয় স্বার্থে অতিরিক্ত প্ররিশ্রম করে সেশনজট দূর করতে হবে।

৪. চতুর্থত, ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাই হবে একমাত্র মাপকাঠি। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে মেধাই হবে উচ্চশিক্ষা লাভের মূলশর্ত। কোটা সিস্টেম বা অন্য কোনো কারণে যোগ্যতা শিথিল করা যাবে না।

৫. পঞ্চমত, শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যোগ্যতাই হবে একমাত্র মাপকাঠি। শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাদের একাডেমিক অর্জন, গবেষণাকর্ম, নিরলস চর্চা ও একাগ্রতার মূল্যায়ন করতে হবে। এর সঙ্গে উচ্চশিক্ষার মান প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। শিক্ষকতার মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের অবশ্যই গবেষণাকর্মে যুক্ত থাকতে হবে। শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও

থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অবশ্যই নিয়মিতভাবে গবেষণাকাজে লিপ্ত থাকতে হবে। কারণ গবেষণা ছাড়া নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৬. শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো (চধু ঝপধষব) প্রণয়ন করতে হবে।

৭. আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরিগুলোকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও সমৃদ্ধ করতে হবে।

৮. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যসূচি (শিক্ষাক্রম) হবে আধুনিক, আন্তর্জাতিক ও সমকালীন। একদিকে যেমন দেশেরও জাতীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা দরকার, অন্যদিকে আধুনিক, আন্তর্জাতিক বিশ্বজনীন পাঠ্যসূচি বা শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিলেবাস তৈরি করতে হবে। শিক্ষাক্রম এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান মানুষ ও সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। মোট কথা, শিক্ষা হতে হবে কর্মমুখী ও গণমুখী।

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত